Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501016 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

Rabindranath and Einstein:
A Discussion on the Possibility of the Existence of Human-Independent Truth
রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন: মানব নিরপেক্ষ সত্যের অস্তিত্বের সম্ভাবনা বিষয়ক এক আলোচনা

Sayantan Nandi
Independent Researcher
West Medinipur

Received on: 02th March 2026
Accepted on: 12th March 2026

Abstract:
The essay under consideration engages with the profound dialogue between Rabindranath Tagore and Albert Einstein on the epistemological and aesthetic constructs of 'truth' and 'beauty.' From this intellectual exchange, it is not untenable to infer that, despite Tagore's canonical recognition as a poet, his cognitive orientation embodies a distinctly scientific temper, marked by analytical depth and ontological inquiry. Conversely, Einstein, notwithstanding his seminal contributions to the theories of relativity and quantum mechanics, reveals an intrinsic poetic sensibility, wherein his scientific contemplations are imbued with a nuanced appreciation of harmony, imagination, and the metaphysical dimensions of existence.

Key Words:
Divine Being, Human Truth, The Supreme Human, Impersonal Human Universe, The Figure of Apollo, Pythagorean Theorem, Humanism, Atharvaveda, Acts of Benevolence, The Ideal Companion.

মূল প্রবন্ধ

'বাস্তবতার প্রকৃতি' বিষয়ই রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তার দুটি বয়ান পাওয়া যায়। কারণ, প্রথম বয়ানটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অগস্ট তারিখে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ম্যাগাজিন বিভাগে। এর লেখক ছিলেন মার্গট আইনস্টাইনের হবু স্বামী সাংবাদিক দিমিত্রি মারিয়ানফ। এই বিবরণ সম্পূর্ণ নয়। দিমিত্রি বলেছেন — 'আমি যেভাবে লিখে রেখেছি তার সারাংশ হচ্ছে এই রকম... '। অর্থাৎ কবি ও বিজ্ঞানীর কিছু কিছু অংশ এই বয়ানে উঠে এসেছে। তবে সম্পূর্ণ নয়। দ্বিতীয় বয়ানটি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের জানুআরি মাসে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই বিবরণে কবি ও বিজ্ঞানীর যে সংলাপ রয়েছে তা মারিয়ানফের দেওয়া বিবরণের সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। এর গোড়াতেই লেখা রয়েছে 'অনুমোদিত বয়ান'। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যেতে পারে এই বয়ানটি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশোধিত। তাই তাঁদের কথালাপের দুটি বয়ান পাওয়া যায়।

পটসডামের কাছাকাছি একটা ছোটো জায়গা রয়েছে যার নাম কাপুট। সেখানে এক টিলার উপরে পাটকিলে রঙের একটি কাঠের বাড়ি, ছাদটা লাল টালির। চারপাশে অনেকগুলি সরু গুঁড়িওয়ালা পাইন গাছ যেন বাড়িটিকে পাহারা দিচ্ছে। এই বাড়িতেই বসবাস করেন গণিতবিদ আলবার্ট আইনস্টাইন। ১৯৩০ সালের ১৪ই জুলাই বিকেল চারটের সময় সামনের বালিঢাকা পথ দিয়ে হেঁটে রবীন্দ্রনাথ

© Santiniketan Sahityapath

আইনস্টাইনের বাড়িতে আসেন। তাঁর পরনে ছিল নীল রঙের নরম কাপড়ে তৈরি পোশাক। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে, একটা হাত ভাঁজ করে পিঠের উপর রেখে তিনি হাঁটছিলেন। তাঁর পাশে শক্ত সমর্থ এবং খাড়া শরীর নিয়ে পা ফেলে হাঁটছিলেন আইনস্টাইন। টিলার উপরে এসে ঘাসে ঢাকা জমিতে একটি হাতলওয়ালা চেয়ারে রবীন্দ্রনাথ বসেছিলেন আইনস্টাইন এবং তাঁর পরিবারের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ বলতে শুরু করলেন তাঁর সাম্প্রতিক লন্ডন সফর আর 'ধর্ম ও মানবতা' বিষয়ে। কবি রবীন্দ্রনাথ যাঁর মাথাটা ভাবুকের মতো আর বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, যাঁর মাথা কবির মতো। মারিয়ানফের দেওয়া এই বিবরণ পড়ে যেন মনে হয় দুই ব্যক্তির স্ব স্ব প্রকৃতিকে উল্টে করে দেখারই ইঙ্গিত দিয়েছেন পাঠককে। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখে মারিয়ানফের মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর মরমী জগতের মধ্যে নিমগ্ন। তাঁর কমনীয় মুখের প্রতিটি ভাবের মধ্যে, প্রতিটি সচল ভাবান্তরের মধ্যে, গভীর অভিনিবেশের ছাপ।

এবার রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের কথালাপ যদি আমরা দেখি, তাহলে ধারণা করে নিতে অসুবিধা হয় না যে, তাঁদের কথালাপে দুটো বিষয় উঠে এসেছে। ক. সত্য ও সুন্দর নিয়ে, খ. আকস্মিকতার জগতে দ্বৈত অস্তিত্বের স্বরূপ নিয়ে। আইনস্টাইন বিশ্বাস করতেন, মানুষের মন বুদ্ধির বাইরেও বিরাজমান আছে সত্য কিন্তু সত্যকে গ্রহণ করতে হবে মানব নির্বিশেষে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে। আইনস্টাইন যখন বিচ্ছিন্ন দিব্য সত্তায় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ করেন কি না জিজ্ঞেস করেন! তখন রবীন্দ্রনাথ জানান — "ঠিক বিচ্ছিন্ন নয়। ব্রহ্মাণ্ড মানুষের অনন্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিধৃত। এমন কোনো কিছুই থাকতে পারে না যা কিনা মানব-ব্যক্তিত্বের অধীন নয়, আর তা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে ব্রহ্মাণ্ডের সত্যও মানবীয় সত্য"[২] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চেয়েছেন, মানুষের অপ্রমেয় সত্তায় নিখিল বিশ্বের ধ্যান ও ধারণা যা মানবসত্তায় গৃহীত হয়। তাই বিশ্বের যা সত্য তা রবীন্দ্রনাথের কাছে মানবসত্য। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টা বোঝাতে গিয়ে একটা উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে, প্রোটন আর ইলেকট্রন দিয়ে জড়পদার্থ গঠিত। তাদের মধ্যে মধ্যে ফাঁক থাকে। যে শূন্যস্থান প্রতিটি ইলেকট্রন ও প্রোটনকে সংবন্ধ করে রেখেছে, তা সত্ত্বেও পদার্থকে নিরেট মনে হতে পারে। অনুরূপভাবে, মানবজাতিও স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত অথচ তাদের মধ্যে রয়েছে মানবীয় সম্বন্ধের এক পারস্পরিকতা, যা কিনা মানুষের বিশ্বকে একটা সজীব ঐক্য প্রদান করে। ঠিক একইভাবে, ব্যক্তি হিসেবে আমরা গোটা ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত, তাই এই ব্রহ্মাণ্ড এক মানবীয় ব্রহ্মাণ্ড। শিল্পকলা, সাহিত্য এবং মানুষের ধর্মীয় চৈতন্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যেন এই ভাবনাকেই অনুধাবন করেছেন। আসলে এই মহাবিশ্বকে 'মানুষের বিশ্ব' নামে উপস্থাপিত করাই হলো রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম পদক্ষেপ। তাই তাঁর সন্দর্ভে মানুষের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী জাগতিক প্রাণ প্রক্রিয়া হলো মানব জন্মের প্রস্তুতি পর্ব। যে বহুকোষী দেহ মানুষ অর্জন করেছিল, তার অভিযোজন ও বিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু চেতনার অপার বিকাশ মানুষকে আলাদা করেছে অন্যান্য প্রাণীকুল থেকে। চেতনাই মানবকে সংহত রূপদান করেছে। চেতনা প্রদত্ত কল্পনাশক্তি তাকে স্ব-অতিক্রমণের ক্ষমতা প্রদান করেছে। কল্পনাশক্তি দান করেছে। এই 'কল্পনাশক্তি' রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবনার অন্যতম ক্ষমতাস্তম্ভ। এই মানুষ অধিকৃত কল্পনাবৃত্তি তাকে কেবল তার জৈবিক প্রয়োজন সাধনের সীমায় বন্দী করে রাখে না বরং তাকে এমন উপলব্ধির সন্ধানে প্রাণিত করে যে উপলব্ধিতে সে পূর্ণতা এবং অমরত্ব লাভ করতে পারে। মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব কখনোই সে অনুমতি প্রদান করতে পারে না, তাই কল্পনাশক্তি পৌঁছে দেয় আপনার ভিতর অনন্ত স্বরূপকে পাওয়ার জন্য। এই পূর্ণ স্বরূপের প্রেমের টানেই মানুষ তার চৈতন্যকে অন্তর্মুখী করে আপনার ভিতর স্থিত প্রকাশ বাসনাকে সার্থক করে তোলে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন এবং সেবা ও পূজার মতন নিষ্কাম কর্মের ভিতর দিয়ে আপনার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে অন্তরস্থিত মহত্তম সত্তার স্বার্থে জীবন নির্বাহ করাই মানুষের সত্য বা মানবধর্ম।

আইনস্টাইন মনে করেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি বিষয়ে দুটি ধারণা রয়েছে। প্রথমত, বিশ্ব মানবের ওপর নির্ভরশীল একক সমগ্র। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের বাস্তবতা মানবসত্তা নিরপেক্ষ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সত্যকে এভাবে দেখতে রাজি নন, কেননা তাঁর কাছে ব্রহ্মাণ্ড যখন অনন্ত মানবের সঙ্গে সুসংগতি লাভ করে তখন সেটাই রবীন্দ্রনাথের কাছে 'সত্য' এবং এই সত্যের মধ্যে তিনি সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করেন। আসলে আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা থাকি ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা ও বিষয়বুদ্ধি নিয়ে। ফলে আমরা সাধারণভাবে সীমাতীতকে, অখণ্ডকে, জগতের পরম সত্যকে সহজে বুঝে উঠতে পারি না এবং সেই সঙ্গে আমাদের অন্তরে উপস্থিত সর্বজনীন, সর্বকালীন মানবকেও বুঝে উঠতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, যেখানে জ্ঞান উপস্থিত প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে যায়, কর্ম স্বার্থের প্রবর্তনাকে অস্বীকার করে সেখানেই মানুষের বৃহত্তর, মহত্তর জীবন-ভাবনা প্রকাশিত হয়। সকল মানুষের ঐক্যের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করতে করতে, বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে একদিন মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মা ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার

আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারে তখনই আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সেই 'অনন্ত মানবে'র সঙ্গে সুসংগতি লাভ করবে। এই সত্যকেই রবীন্দ্রনাথ 'প্রকৃত সত্য' বলে মনে করেছেন। আইনস্টাইন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের এই ধারণাকে 'ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে বিশুদ্ধ মানবীয় ধারণা' বলে জানেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন 'এ বিশ্ব এক মানবীয় বিশ্ব'এ সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক ধারণা, তা-ও বৈজ্ঞানিক মানুষেরই ধারণা। আসলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে 'আমি' উপলব্ধির কোনো অর্থ নেই। ব্যক্তি মানুষের সত্তা জাগ্রত হলেই সেই সত্তার সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের মেলবন্ধন ঘটে। ব্যক্তি মানুষের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অর্জিত চৈতন্যের দ্বারা যেহেতু এই উপলব্ধি ঘটে, সেখানে এই উপলব্ধিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় এই বিষয়টাকেই 'বৈজ্ঞানিক ধারণা' ও 'বৈজ্ঞানিক মানুষের ধারণা' বলে উল্লেখ করতে চেয়েছেন। সুতরাং আমাদের বাদ দিয়ে এ বিশ্বের কোনো অস্তিত্বই নেই, যেন রবীন্দ্রনাথ বলতে চান — "আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর / তোমার প্রেম হতো যে মিছে।"[৩] রবীন্দ্রনাথের কাছে এই বিশ্ব একটা আপেক্ষিক বিশ্ব, যার বাস্তবতা আমাদের চৈতন্যের ওপর নির্ভরশীল। যুক্তির ও আনন্দের কোনো একটা তুল্যমান আছে, যা একে সত্যতা দান করে, এই তুল্যমানও সেই অনন্ত মানবের, যাঁর অভিজ্ঞতাগুলি আমাদের অভিজ্ঞতা সমূহের মধ্যে দিয়ে রূপ ধারণ করে।

সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ করতে হয়, কারণ তার দ্বারাই অন্যদিকে মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ সম্পাদিত হয়। একটি ডিম থেকে যেমন পাখির ছানা ক্রমে মুক্ত জীবনের স্বাদ পায় তেমনি ক্ষুদ্র মানুষ তাঁর ত্যাগ ও সাধনার দ্বারা বৃহৎ মানুষে উন্নীত হয়ে একদিন উজ্জ্বল দীপ্তিতে ঘোষণা করে — 'অয়মহং ভোঃ-এই যে আমি'। শত শত শতাব্দী ধরে মানুষের ভিতরকার সেই পরিবর্তন সম্পাদিত হয়ে আসছে। যুগ-যুগান্তরের প্রবাহে মানবীয় চিন্তাধারা বিকাশের মাধ্যমে মানুষের সভ্যতা ক্রমে আজকের দিনে এসে পৌঁছেছে। এভাবেই অনিশ্চিত আগামীর দিকেও মানুষের প্রাণপণ আগ্রহ লক্ষ করা যাবে। একদিন অনাগত কালের সত্য যুগের প্রত্যাশা হয়তো সফল হবে সকল প্রকার 'শ্রেয়োনুষ্ঠানে'র মধ্য দিয়ে। দুঃখের দীপ্তিতে, মৃত্যুর গৌরবে আগামী দিনের মানুষ আনন্দমহিমায় অধিষ্ঠিত হবে। তাকে মনে করতে হবে, তাকে বড়ো করে বাঁচতে হবে, তার অন্ন যেমন তেমন নয়, তার বসন, তার বাসস্থান কেবল কাজ চালাবার জন্য নয়, 'বড়'কে প্রকাশ করবার জন্য। এইটিই মানুষের 'প্রকৃত ধর্ম'। তার সাধনা একদিক থেকে যেমন স্বভাব থেকে স্বভাবান্তরের সাধনা তেমনি অন্যদিকে তাকে হতে হবে সৌন্দর্য্যে, কল্যাণে, বীর্যে, ত্যাগে অন্তরের অন্তরতম 'বিশ্বমানব'। যে বিশ্বমানবকে বাউল সাধকেরা বলেছেন, 'মনের মানুষ' তাঁকে তাঁরা অন্বেষণ করেছেন দেশে-বিদেশে। এই অন্বেষণেরই প্রার্থনা রয়েছে বৈদিক সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ যেন এক অনন্ত সত্তার উপলব্ধি। আমাদের আবেগ দিয়ে এবং কর্মের মধ্য দিয়ে তাকে উপলব্ধি করতে হয়। 'পরমমানব', যাঁর কোনো ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা নেই তাঁকে আমরা উপলব্ধি করি আমাদের সীমাবদ্ধতা দিয়ে। আসলে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি মানুষের মধ্যে পরমমানবের সন্ধান করতে চেয়েছেন। ব্যক্তির মধ্যে দুটো দিক রয়েছে। একদিকে সে বিষয়বুদ্ধি নিয়ে নিজেদের বাহ্যিক ইচ্ছেপূরণের কথা ভাবে এবং সেই মতো সে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করে। কিন্তু এই বৈষয়িকতার বাইরে যখন ব্যক্তি মানুষ অন্তরকে তথা 'আমি'কে উপলব্ধি করে তখনই সে বিশ্বমানব বা পরমমানবে উত্তীর্ণ হয়। ব্যক্তিগত জীবনে ভুল ভ্রান্তি ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা সেই পরম-মানবের দিকে অগ্রসর হই। সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে বিশ্বমনের মহাদেশ সৃষ্টি হয়েছে একথা বললে বোধহয় ভুল বোঝা হবে। যদিও বিশ্বমনের মধ্যে ব্যক্তিমনের আশ্রয়, তবু সমস্ত ব্যক্তি মনের যোগফল বিশ্বমন নয়। যে পরিপূর্ণতার অভিমুখে ব্যক্তিমন নিয়ত আকৃষ্ট হচ্ছে 'নিখিলমানব' মনের মধ্যে তা আইডিয়া রূপে সত্য হয়ে আছে। ব্যক্তিমন তাকে যতই বিষয়ীকৃত করবে ততই আইডিয়ার সত্যতা সার্থক হবে। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, বিজ্ঞানের কারবার তাকে নিয়েই যা ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ নয়, যা কিনা সত্যের নৈর্ব্যক্তিক মানববিশ্ব। ধর্ম এইসব সত্যকে উপলব্ধি করে এবং আমাদের গভীরতর আকুতিগুলির সঙ্গে তাদের সংযোগ স্থাপন করে, সত্য সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিচেতনা বিশ্বজনীন তাৎপর্য অর্জন করে। ধর্ম সত্যের উপর মূল্যবোধ আরোপ করে, সত্য যে ভালো সেটা সত্যের সঙ্গে আমাদের সুসংগতি মারফত আমরা জানতে পারি।

প্রকৃতির প্রয়োজন পেরিয়ে মানবধর্ম উদ্ভুত হয় এক ধরনের অতিরিক্ততা থেকে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য, আনন্দশক্তি। সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত ভূত-ভবিষ্যৎ। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, মানুষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যকে পেরিয়ে যে আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ববেদ তাকেই বলেছে 'ঋতং সত্যম'। আমরা সেই ঋতে, সত্যে, তপস্যায়, ধর্মে, কর্মে পরমাত্ম শক্তিকে বা সেই বৃহৎমানবকে আত্মবিকৃত করি। ফলে আমাদের মানবজীবন একান্তভাবেই যে উৎকর্ষের পথে চলেছে তা অস্বীকার করা যায় না। তবে এ কথা মাথায় রাখতে হবে যে, সেই পরমাত্ম শক্তি বা

বৃহৎমানব বা আমাদের আরাধ্য ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে বস্তু-অব্যবচ্ছিন্ন একটা তত্ত্বমাত্র নন। যখন তাঁর প্রতি ভক্তি জেগে ওঠে, যখন আনন্দ পাই, তখন আমার এই আমি বোধই বৃহৎ হয়, গভীর হয় প্রসারিত হয় আপন সীমাতীত সত্যে।

সেই পরমাত্মা শক্তিকে সমধিকভাবে অনুধাবন করতে গেলে আমাদের প্রয়োজন সংঘশক্তির সামাজিকীকরণ এবং ধর্মীয়করণ। পরম মানবিক সত্তাকে পেরিয়ে পরম যে জাগতিক সত্তা রয়েছে তা আসলে এক নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা। তাঁকে প্রিয় বলা অর্থহীন। তিনি ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ বর্জিত। 'তিনি আছেন' এছাড়া তাঁকে কিছুই বলা চলে না। কী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, কী দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উভয়ক্ষেত্রেই তাঁর সদর্থক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। 'আমার আত্মা', 'তোমার আত্মা' ও 'তার আত্মা' এমন কত এমন কত আত্মা থাকলেও তারা যে এক আত্মার মধ্যে সত্য তাকেই আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'পরমাত্মা'। এই পরমাত্মা 'মানব পরমাত্মা', ইনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' — ইনি সর্বদা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। জগতের যা কিছু ঐশ্বর্য রয়েছে, শ্রী রয়েছে, শ্রেষ্ঠতা রয়েছে — সেসব তাঁরই তেজের অংশ থেকে সম্ভূত। সেকারণে আপন আত্মায় অন্য সকল মানুষের আত্মার পরিচয় পাওয়াটি আমাদের বিশুদ্ধ অন্বেষণের দিকে নিয়ে যায়। তবে কেবল জানার মাধ্যমে তাঁকে পাওয়া যায় না, তাঁকে পেতে হয় হওয়ার দ্বারা। সেই আহ্বানের আকর্ষণে মানুষ বেরিয়ে পড়েছে অজানার দিকে, এই যাত্রার ইতিহাসই তার ইতিহাস। 'মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গোতে নাচিতে নাচিতে' মৃত্যুকে ভয় না করে, সত্যকে ধ্রুবতারা জ্ঞান করে মানুষকে নির্ভয়ে দৌড়োনোর কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'চিত্রা' কাব্যের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেন সেই কথাই বলতে চেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য ও সুন্দর মানবিক ধ্যান ধারণায় সম্পৃক্ত। অবশ্য সুন্দর সম্পর্কে তাঁদের কোনো মতের পার্থক্য হয়নি। উভয়েই আলোচনায় উদাহরণস্বরূপ একমত হন যে, "কোনো মানুষের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তখন বেলভেডিয়ার-এর অ্যাপোলো আর সুন্দর থাকবে না।"[৪] আইনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের 'সত্য' ধারণার সঙ্গে একমত হতে পারেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সত্য মানুষের মধ্য দিয়েই উপলব্ধ হয়। সুন্দরের অধিষ্ঠান পরম সংগতির আদর্শের মধ্যে, যা বিশ্বজনীন সত্তার মধ্যে বর্তমান। সত্য হচ্ছে বিশ্বমনের নিখুঁত উপলব্ধি। আমরা ব্যক্তি মানুষেরা আমাদের নিজেদের ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে, আমাদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, আমাদের আলোকিত চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে তার দিকে অগ্রসর হই — এছাড়া আর কীভাবেই বা আমরা সত্যকে জানতে পারি? আইনস্টাইন বিশ্বাস করেন, সত্য মানব নিরপেক্ষভাবেই সত্য তবে তিনি জানেন এই সত্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণ করা যাবে না। আইনস্টাইন উদাহরণ দিয়েছেন এই বলে যে, জ্যামিতির পিথাগোরাসের উপপাদ্য এমন কিছু বলে যা মোটের উপর সত্য এবং তা মানব অস্তিত্ব নিরপেক্ষ ভাবেই সত্য। এছাড়া তিনি মনে করেন যে, মানব নিরপেক্ষ বাস্তবতা যদি থাকে তাহলে সেই বাস্তবতার সাপেক্ষে একটা সত্য নিশ্চয়ই আছে। আর ঠিক একই ভাবে প্রথমটি অস্বীকার করলে পরেরটির অস্তিত্বও অস্বীকার করতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ধারণা 'সত্য' যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে অভিন্ন, তাকে অবশ্য মূলগত মানবীয় হতে হবে। অন্যথায় আমরা ব্যক্তি মানুষেরা যা কিছুকে সত্য বলে উপলব্ধি করবো তার কোনো কিছুকেই সত্য বলা যাবে না। অন্ততপক্ষে বিজ্ঞানে যাকে সত্য বলে বর্ণনা করা হয়, যাকে যুক্তিসম্মত পথেই আয়ত্ত করা সম্ভব অর্থাৎ কিনা এমন এক চিন্তা অঙ্গের মারফত যা মানবীয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শন থেকে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন — "ব্রহ্মন হলো সেই পরম সত্য বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমন যাকে ধারণা করতে পারে না, যা অনির্বচনীয়, যাকে উপলব্ধি করবার একমাত্র পথ হলো ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে সেই অনন্তের মধ্যে নিঃশেষে বিলীন করে দেওয়া। কিন্তু এ ধরনের সত্য তো বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না। যে সত্য স্বরূপের আলোচনা আমরা করছি তা আসলে সত্যের বাহ্যরূপ, অর্থাৎ মানুষের মন যাকে সত্য বলে ভাবে, এবং সেই কারণেই যা মানবীয় বটে, তাকে বলা যায় মায়া বা বিভ্রম।"[৫] আইনস্টাইন এই বিভ্রমকে কেবল ব্যক্তিবিশেষের নয়, সমগ্র মানবজাতির বিভ্রম বলেই মনে করেন। আসলে বিজ্ঞানে আমরা এক শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাই যা আমাদের আপন আপন মনের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সেই সত্য অনুধাবনের লক্ষ্যে নিয়ে যায়, যা রয়েছে বিশ্বমানবের মনে।

আইনস্টাইন সত্য ও সুন্দরের মধ্যে 'সুন্দর'কে মানবনির্ভর একটি ধারণা বলে মেনে নিলেও 'সত্য'কে মানবচেতনা নিরপেক্ষ একটি সত্তা বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের মতে 'সত্য', 'সুন্দর' কোনো ধারণাই মানবচেতনা নিরপেক্ষ নয়। আমরা যে মুহূর্তে মানবচেতনা অতিরিক্ত কোনো বিষয়ের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করতে যাই, তখনই তা আমাদের মানবীয় চেতনা বৃত্তের অন্তর্গত হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিও তাই মানবচেতনার ওপর নির্ভরশীল। কোনো কিছু অস্তিত্ববান হলে তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষিত সত্তা হতে হবে। এমন কেউ থাকবেন যিনি বস্তুটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন। কেউ যদি এমন কোনো কিছুর কথা কল্পনা করে যা আছে কিন্তু কারো প্রত্যক্ষের

© Santiniketan Sahityapath

অধীন হয়ে নেই, তাহলে তার নিজের অজান্তেই তিনি এমন বস্তুর কথা বলছেন যা তার নিজের চিন্তা বা প্রত্যক্ষের অধীন। কিন্তু প্রশ্ন জাগে নিখিল বিশ্বের বস্তুসমূহ, ধরা যাক আমার লেখার টেবিলটি যখন তালাবন্ধ ঘরে একা পড়ে থাকছে তখন কী তার অস্তিত্ব থাকছে না, কারণ তখন তো কেউ সেটিকে প্রত্যক্ষ করছে না। বার্কলে এই সমস্যার সমাধানে তাঁর দর্শনে অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরের প্রকল্প রচনা করে বলেন যে, সবকিছুই ঈশ্বরের অসীম প্রত্যক্ষের অধীন তাই বস্তুসমূহের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় না। আর আইনস্টাইন যখন রবীন্দ্রনাথকে বলতে শোনেন সত্যও মানবচেতনার অংশ, মানব নিরপেক্ষ কোনো কিছু নয়, তখন আইনস্টাইন একই প্রশ্ন উত্থাপন করলে রবীন্দ্রনাথ বলেন — "হ্যাঁ, ওটা ব্যক্তিমনের বাইরে থাকবে বটে, কিন্তু বিশ্বমনের বাইরে নয়। আমি দেখছি, সেটা আমার মতো যেকোনো চেতনায় প্রতীয়মান হতে পারে।"[৬] এই উত্তরটির প্রথম বাক্য থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, বার্কলের দর্শনে জাগতিক বস্তুসমূহের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে গিয়ে যেখানে ঈশ্বরের প্রকল্প রচিত হয়, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সেই অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর প্রতিস্থাপিত হন 'বিশ্বমানব মন' দ্বারা।

আইনস্টাইন মনে করেন মানব ব্যতিরিক্ত সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিটাকে ব্যাখ্যা করা কিংবা প্রমাণ করা যাবে না ঠিকই, কিন্তু এ এমনই এক বিশ্বাস যা থেকে কেউই মুক্ত থাকতে পারে না — এমনকি আদিম মানুষেরাও নয়। আসলে সত্যের ওপর আমরা এক অতিমানবিক বিষয়তা আরোপ করি, যা আমাদের জন্য অপরিহার্য। এই বাস্তবতা আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের অভিজ্ঞতা এবং আমাদের মনের উপর নির্ভর করে না। আইনস্টাইনের কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উদাহরণ দিয়ে বলছেন যে, "বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে একটা কঠিন বস্তু হিসেবে এই টেবিলটা একটা বাহ্যরূপ মাত্র। কাজেই মানুষের মন যাকে টেবিল বলে জানছে, মন যদি না থাকতো তাহলে তার কোন অস্তিত্বই থাকতো না। একইসঙ্গে একথা স্বীকার করতে হয় যে, টেবিলটার চূড়ান্ত ভৌত বাস্তবতা বলতে কেবল বহুসংখ্যক পৃথক পৃথক ঘূর্ণায়মান বৈদ্যুতিক বলের কেন্দ্রকে বোঝায়, আর এটাও মানবমনেরই ধারণা।"[৭] আসলে সত্য অনুসন্ধান এর ক্ষেত্রে বিশ্বমানব মন ও ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ সেই একই মনের মধ্যে অনন্তকাল দ্বন্দ্ব চলছে। দ্বন্দ্ব নিরসনের নিরন্তর প্রবাহ চলতে থাকে আমাদের বিজ্ঞানে, দর্শনে আর আমাদের নীতিশাস্ত্রে। যদি এমন কোন সত্য থাকে যা মানবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত, তবে আমাদের কাছে তা সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন।

পরিশেষে বলতে পারি যে, বিজ্ঞানের যে নির্বিকার দৃষ্টিভঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথ একসময় সাহিত্যরসের পরিপন্থী বলে মনে করেছিলেন, সেইটাই পরবর্তীতে তাঁর মনে হয়েছে, খাঁটি আনন্দের উৎস, এমনকি শাশ্বতভাবে আধুনিক। মোহমুক্ত হয়ে নির্বিকার চিত্তে জগতকে দেখার প্রয়াস রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত ও পরিবর্তিত করেছিল। একথা বোধহয় বলা যায় যে, চেতনানির্ভর জগৎ থেকে চেতনারহিত দর্শনের প্রতি রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলেন। আর মনোজগতের এই পরিবর্তনের পিছনে ছিল আইনস্টাইন এর সঙ্গে কথালাপ।

তথ্যসূত্র:

১। 'রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন : এক অমীমাংসিত সংলাপ', সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম মুদ্রণ জানুআরি ২০১৪, পৃ. ৭১
২। ওই, পৃ. ৬৮
৩। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', তৃতীয় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২২ শ্রাবণ ১৪১৯, ৭ অগস্ট ২০১২, পৃ. ৮৯
৪। 'রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন : এক অমীমাংসিত সংলাপ', সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা, সাহিত্য সংসদ, প্রথম মুদ্রণ জানুআরি ২০১৪, পৃ. ৬৯
৫। ওই, পৃ. ৭০
৬। ওই, পৃ. ৭০
৭। ওই, পৃ. ৭১

—

© Santiniketan Sahityapath